ভোরের আলোর কানাকানি

প্রবুদ্ধ বাগচী

'বঙ্গদর্শন' কি একটি লিটল ম্যাগাজিন? উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যখন বাংলা গদ্য সাহিত্যের সদ্যযুবক ধারাটিকে আরেক প্রখর যুবক বঙ্কিমচন্দ্র শক্ত কাঠামোয় বাঁধতে চাইছেন, তখন তিনি যে সাহিত্যপত্রের কথা ভাবলেন, তাকে কি লিটল ম্যাগাজিন বলা যাবে? আপাতত এই নিরীহ প্রশ্নটাকে নিয়ে শুরু করা যাক। পাশাপাশি আরেকটি পত্রিকার নাম করতে চাই। গত শতকের ষাটের দশক থেকে আরম্ভ করে আজও পর্যন্ত যেটি সমানভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যে পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার এতটাই গুরুত্ব আর বিশ্বাসযোগ্যতা, যে যে কোনও গুণী মানুষ একবাক্যে স্বীকার করে নিতে পারেন। পত্রিকাটি 'ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'— ইংরেজি ভাষায় সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গেই এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হতেপারে একদাখ্যাত 'ফ্রন্টিয়ার' বা 'নাউ' এর কথা। এগুলিও কি লিটল ম্যাগাজিন বলে চিহ্নিত হবে? যদি না হয়, তাহলে কাদের বলব লিটল ম্যাগাজিন?

এই গোলমালটা খুব পুরনো ব্যাপার, অনেকটা সেই প্রাচীন একান্নবর্তী পরিবারগুলির মধ্যেকার শরিকি বিবাদের মতো। অথচ সাধারণভাবে বাজারে এই লিটল ম্যাগাজিন সম্বন্ধে একটা চালু কথা হল, এগুলি নাকি অবানিজ্যিক। কুড়ি বছরের বেশি লিটল ম্যাগাজিনের নানান সংসারের শরিক হয়েও এই বক্তব্যের আমি মর্মোদ্ধার করতে পারি নি। এটা আমার ব্যর্থতা। কারণ, এমন কোনও লিটল ম্যাগাজিন (আপাতত এই শব্দটাকে স্বীকার করে নিচ্ছি) আমার অন্তত চোখে পড়েনি যার গায়ে কোনো বিনিময় মূল্য ছাপা নেই। এই বিনিময়মূল্য কি পত্রিকাটির সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন সেইসব পত্রিকার সম্পাদক, সংগঠক বা প্রকাশকরা। এমনকী এসব পত্রিকায় কিছু বিজ্ঞাপনও যে গ্রহণ করা হয় না, এমন নয়। কোথাও কোথাও দেখেছি পত্রিকার আগে পরে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বেশ যথেষ্ট, এইসব বিজ্ঞাপনদাতাদের আনুকূল্য পত্রিকা প্রকাশনার অবাণিজ্যিক তুলসীতলা অশুদ্ধ করে কিনা, সে বিষয়ে কোনো নিশ্চিত মতপ্রকাশ করতে আমি কুণ্ঠিত।

তবে একটু উল্লেখ করতে চাই, গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা ঘিরে যে বিশেষ আলোড়ন উঠেছিল বসে জনশ্রুতি, যেসব কাহিনী পরে নানান জায়গায় ফলাও করে লিখেছেন ওই পত্রিকার আয়োজক ব্যাক্তিত্বরা। তাঁদের সেসব লেখা পড়লে দেখা যায়, পত্রিকার প্রকাশন ব্যয় মেটানোর জন্য কিছু কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহের চেষ্টা তাঁরাও করেছেন। আমাদের প্রজন্মের অনেকেই বা তার আগে - পরের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর্যন্ত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশের এই রোমাঞ্চিত কাহিনিকে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের এক অনিবার্য খাড়াই পথ বলে মানতেন, এখনও অনেকে মানেন হয়তো। কিন্তু এই উৎক্রান্তির পথে বিজ্ঞাপনী অনুদান অন্তত ব্রাত্য ছিল না। তাহলে কি চেনা সংজ্ঞার আদলে 'কৃত্তিবাস' -ও লিটল ম্যাগাজিন নয়?

সমস্যাটা বেড়েই যাবে, যদি আমরা আবার একটু পিছিয়ে গিয়ে মনে করে দেখি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের এপার - ওপার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', 'সবুজপত্র', 'সচিত্র ভারত', 'শনিবারের চিঠি' প্রমুখ অভিজাত সাহিত্যপত্র বা সাময়িকীগুলির কথা। এগুলি সেকালের অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা, যারা একটা আগ্রহী পাঠক গোষ্ঠী তৈরি করতে পেরেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পরের বাঙালী সমাজ, যেখানে বৃটিশ বিরোধী রাজনীতির আবছা আলোড়ন, প্রায় বৈচিত্র্যহীন পিছিয়ে থাকা গ্রাম ও মফস্বলজীবন — তবু গড়পড়তা মধ্যবিত্ত পরিবারের যেখানে কিছুটা হলেও শিক্ষার চর্চা আছে, তাঁদের বাড়িতে এরকম একটি বা দুটি পত্রিকা কেনা হত। আধুনিক বিপণন থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে, ডাকবাহিত হয়ে সেসব পত্রিকা এসে পৌঁছাতো বাড়িতে, বাড়ির পুরুষটি, অন্দরমহলের মহিলারা সেসব পত্রিকা পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন এবং বছর শেষে একবছরের সবকটি সংখ্যা বাঁধাই করেও রাখতেন কেউ কেউ। বছর কয়েক আগে, কলকাতা শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে 'দেশ' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন দেখা যেত, যাতে লেখা হত, এই পত্রিকাটি 'বাঙালির মননের সঙ্গী'। এই ঘটনার অনেক আগে, ওইসব পূর্বোল্লিখিত সাময়িকপত্রগুলির কিন্তু সত্যিই বাঙালির মননের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল।

অথচ কী আশ্চর্য, এসব পত্রিকার অনেকগুলিতেই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হত। তাহলে এইসব পত্রিকাকে কোন গোত্রে ফেলা হবে?

এইসব পুরনো পত্রিকাগুলি নিজেদের প্রকাশনা উদ্যোগে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে সাথী করে নিজেদের জাত খুইয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই কিন্তু এই বিজ্ঞাপন নিয়ে একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতার শরিক হয়েছিলাম বছর দশেক আগে চন্দননগর সরকারি কলেজের গ্রন্থাগারে। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজনে সেই গ্রন্থাগারে কাজ করতে গিয়ে হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলাম পুরনো সাময়িকপত্রের এক বিরাট ভান্ডার। আর সেই পত্রিকাগুলির জীর্ণ হয়ে আসা পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়েছিল নানান বিচিত্র বিজ্ঞাপন, আজকে যারা নিছকই ইতিহাস — এইচ. বোসের কুন্তলীন, বেঙ্গল কেমিক্যালের মলম, ফেমিনা স্নো, সেকালের টসের চা, বাটার জুতো ইত্যাদি। একইসঙ্গে আলাদা এরকম বিজ্ঞাপণী ভাষা যার সঙ্গে কখনও কখনও স্বাধীনতাপূর্ব বাঙালি উদ্যোগপতিদের এরকম স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের ঘোষণা রয়েছে। আজকের বিশ্বায়িত ভুবনের কর্পোরেট অ্যাড-এর সঙ্গে যার যোজন দূরত্ব। সেদিনই মনে হয়েছিল, সমাজ বিবর্তনের কৌতুহলী গবেষকের কাছে এসব বিজ্ঞাপনভাষ্য একেকটি মূল্যবান অভিজ্ঞান। বাংলা সাময়িকপত্রের মধ্যবর্তিতায় যদি কেউ বাঙালি সমাজের ইতিহাস লেখেন তবে এগুলিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। আজকের অনেকদিন পর, অন্য প্রসঙ্গেই মনে হচ্ছে, এইসব পত্রিকাগুলি বিজ্ঞাপনের আনুকূল্য অজান্তেই করেছে। লিটল ম্যাগাজিন হোক বা না হোক, সাময়িক পত্রগুলির কাছে আমাদের এমন প্রত্যাশা থাকাটাও কি খুব ভুল?

কিন্তু তাহলে, কাকে বলব ম্যাগাজিন?

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় 'লিটল ম্যাগাজিন' এই অবয়বহীন অভিধা আদৌ সুসংহত নয়। ঠিক যেমন কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'আট

ফিল্ম' আর 'কমার্শিয়াল ফিল্ম' এর নাম শুনলেই 'ওরে বাবা' বলে পালিয়ে বাঁচতেন, অন্যদল 'কমার্শিয়াল ফিল্ম' এর নামে এমন নাকমুখ কোঁচকাতেন মনে হত তাদের চিরতার জল খেতে বলা হচ্ছে! দুটো প্রবণতার কোনওটাই স্বাস্থ্যকর নয়। 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দবন্ধের মধ্যেও বোধহয় এমন একটা চিত্রকল্প বাসা বেঁধেছে যাতে মনে হয় দারুন একটা লড়াই, সংগ্রাম, সাংঘাতিক একটা আদর্শনিষ্ঠ আন্দোলন, আত্মত্যাগ সবকিছু মিলেমিশে একাকার এক কোলাজ। ঠিক যেমন, আগে বামপন্থী দলের কর্মী বললেই চোখে ভাসত একটা স্বপ্নময় চোখ। উস্কোখুস্কো চুল, অবিন্যস্ত দাড়ি, লম্বা ঝুলের জীর্ণ পাঞ্জাবী, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আজকে সেই স্বপ্নমাখা চোখ রঙিন রোদ চশমায় ঢাকা থাকে, গেঞ্জি-জিনসের চকচকে পোষাকের শরিক হয়ে থাকে মোবাইল ও মোটরবাইক। 'লিটল ম্যাগাজিন' নিয়েও আমার মনে হয়, এরকম অতিশয়োক্তির মোহ আবরণ সরিয়ে রাখা দরকার। কেন? সেকথায় পরে আসবো। আসুন, আপাতত খুঁজে নিই লিটল ম্যাগাজিনের একটা অবজেকটিভ সংজ্ঞা।

এই পশ্চিমবাংলায় লিটল ম্যাগাজিনের অনুষঙ্গে যে ক্লান্তিহীন মানুষটির কথা আমাদের সকলেরই মনে পড়ে, সেই সন্দীপ দত্ত নিজেই এই সংজ্ঞাটিকে লালন করেন। তাঁর কথায়, লিটল ম্যাগাজিন যে কোনো দেশ ও জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক। মনে মনে আমি এই সংজ্ঞাটির সমর্থক কারণ এই পরিচয়ের কষ্টিপাথর খুব সহজে লিটল ম্যাগাজিনের গোত্র ও গোত্রহীনতা চিহ্নিত করা যায়। শুধু যেটুকু আড়ষ্টতা থাকে, তা ওই লিটল ম্যাগাজিন শব্দটাকে ঘিরে। কেননা, শ্রী সন্দীপ দত্ত, যিনি আকৈশোর লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে ভাবুক, তিনি ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টায় যখন নিজের বাসগৃহে লিটল ম্যাগাজিনের সংগ্রহশালা তৈরি করেছেন তখন কিন্তু তার নাম দিয়েছিন 'বাংলা সাময়িকপত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র' — সেটা উনিশশো আটাত্তরে তেইশে জুনের কথা। এর আট বছর পরে উনিশশো ছিয়াশিতে লাইব্রেরির নাম পাল্টে রাখা হয় - 'লিটল ম্যগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র'। এই পরিবর্তনের নেপথ্য প্রণোদনা কী ছিল আমার জানা নেই। তবে যেকোনও সাময়িকপত্রের সারিবদ্ধতা থেকে নির্দিষ্ট চারিত্র্য পরিসীমার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নগুলি বেছে নেওয়ার অভিপ্রায় বহন করে যদি 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দযুগলকে নির্বাচন করা হয়, তাতে আমি সহমত। আর, এই সূত্রে বোধহয় ভেবে নেওয়া চলে, সকলেই নয়, কেউ কেউ লিটল ম্যাগাজিন। এই হয়ে ওঠা বা হয়ে না ওঠাটা সম্পূর্ণত তার চরিত্র - নির্ভর, বিজ্ঞাপন - প্রকাশ বা প্রত্যাখ্যান, বাণিজ্যিক সফলতার বা ব্যর্থতার সঙ্গে অন্তত তার কোনো যোগাযোগ থাকাটা সমীচিন নয়। এই যুক্তিক্রমে 'বঙ্গদর্শন' বা 'ফ্রন্টিয়ার', 'প্রবাসী' থেকে 'কৃত্তিবাস' সবই লিটল ম্যাগাজিন হতে পারে। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ শেষ পর্যন্ত একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, তার অন্য কোনও উৎসমুখ কি লুকিয়ে তাই আমাদের সামাজিক ইতিহাসের ভিতর?

একটু ভেবে দেখতে বলি, উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সূত্রে যে আলোকপ্রাপ্ত আধুনিকতার সূত্রপাত বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যের মননে, তার একটা প্রত্যঙ্গ কিন্তু সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশ, যা সম্ভব হয়েছিল ছাপাখানার প্রযুক্তির বিকাশের ফলে। এরই সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হবে সময় সময়ে বাংলা সাহিত্যের অন্য এক সন্ধান, রোমান্টিক আত্মপরিচয়কে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখা — অর্থাৎ, আমার নিজের কথাটুকু বলে ফেলার তাগিদ একেবারেই আমার নিজের মতো করে। দেবদেবীর আখ্যান নয়, ধর্মপ্রচারের লৌকিক কাহিনিও নয়, নিজের ভাবনা উড়াল দেবে নিজের পথে— সেই পথের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে থাকবে সামাজিক অসংগতির নুড়ি পাথর, ব্যক্তি মানুষের রক্তমাংসের কামনা - বাসনা, এমনকী আধ্যাত্মিক ভাবনাও— এইসব কিছুকে জড়ো করে তৈরি হবে বাঙলা উপন্যাস, নাটক, কবিতা, নকশা জাতীয় সমাজ আলেখ্য। সাময়িকপত্রের প্রকাশের পেছনেও থাকবে এরই এক সম্প্রসারিত ভঙ্গিমা। ইউরোপীয় চিন্তাধারার সমন্বয়ে আঙ্গিকে ও ভাবনায় যে নতুন বাঙলা উপন্যাস লিখবেন বঙ্কিমচন্দ্র, তারও তো একটা প্রকাশ মাধ্যম চাই— 'বঙ্গদর্শন' হতে পারে সেই মঞ্চ, তাই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ হয়। যদি একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখা হয়, বোঝা যাবে, সেই উনবিংশ শতক থেকে আজও পর্যন্ত সাময়িকপত্র প্রকাশের পেছনে যে সামাজিক মানসিকতা তা হল আত্ম ভাবনার পরিচয় ও পরিসীমাকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা— কখনও সেই ভাবনার শরিক একক কি ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন। এটাও বুঝে নেওয়া দরকার, যিনি বা যারা সমাজের প্রচলিত স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেদের কথা আলাদা করে বলতে চান, এই চলতি হাওয়ার তাঁদের প্রাণ - মনের সঠিক পুষ্টি ঘটে না। কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন হোক বা প্রকট হোক আড়াআড়ি বা অসম্পূর্ণতা আছে। আসলে তারা সেই অসম্পূর্ণতাটুকুরই ভাষ্য তৈরি করেন। এই একই কাজ সৎ সাহিত্যের সৎ সংস্কৃতির এবং সৎ রাজনীতিরও। তাই যেখানে যারা যেটুকু পারেন না, সাময়িকপত্র যদি তা পেরে ওঠেন, তাহলে তারা অনিবার্যত দেশ বা জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির বাহক হয়ে ওঠেন, যাকে আমরা আগে চিহ্নিত করেছি লিটল ম্যাগাজিনের স্বধর্ম বলে।

এই ধরনটাকেই কেউ কেউ অনেক পরে অতি সরলীকরণ করে বলতে চাইবেন অ্যান্টি-এস্ট্যাবলিশমেন্ট বা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা হিসেবে। আবারও হয়তো একটা ভুলরকম চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে চাইবে লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞা। বরং রবীন্দ্রনাথের গানে পংক্তির থেকে ধার নিয়ে আমরা সংশোধন করে নিতে পারি এই ভুলের ধরণ, বলতে পারি লিটল ম্যাগাজিন আসলে 'নব ছন্দের তালে' বিধৃত গান, বারবার যে নতুনকে খুঁজে নিতে হয়— কারণ 'নতুন' শব্দটির কোনো চিরস্থায়ী সংজ্ঞা এখনও অনাবিষ্কৃত।

আর সত্যি সত্যিই তো সেই নবজাগরণ যুগে প্রভাত থেকে আজও পর্যন্ত এই কাজটাই করে আসছে লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্রবহ সাময়িকপত্রগুলি। এ যাবৎ যত সাহিত্যের বাঁকবদল, যত সামাজিক স্বপ্নের দিশাবদল সবই কোনও না কোনও ভাবে ধরা আছে কোথাও— হয়তো কোথাও সেসব লিখন ধূলিমলিন কিন্তু সমস্ত 'পুরানো আখরগুলি' হারিয়ে যায়নি বলেই আমার বিশ্বাস।

২.

আমাকে মার্জনা করবেন, এই আপ্তবাক্য দিয়ে এ আলোচনার যতিটানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন না তাতে কিছু অর্ধসত্যের পলি থেকে যাবে, যে পলিতে অন্তত কোনও ফসল ফলে না। যদি ইতিহাস মানি, দেড় শতকের বাংলা সাময়িক পত্রের যে ধারাবাহিকতা তার মধ্যে কখনও কখনও গতিরুদ্ধকারী শৈবালের শিকড় গেড়ে বসা, স্রোতের পাশাপাশি কিছু অনুর্বর ধিক্কৃত অঞ্চলের জেগে ওঠা। এই খেইটুকু ধরিয়ে না দিলে অনৃতভাষণ হবে।

সমাজবিদরা বলবেন, সমাজের মূল স্রোতের ভিতরে অনেক রকম স্রোতের দ্বন্দ্ব - প্রতিদ্বন্দ্ব থাকে, সমাজ মানসিকতার অনেক রকম স্তরও বোধহয় থাকে। হতে পারে, তার একটা তির্যক অভিক্ষেপ এসে পড়ে সাময়িকপত্রের প্রকাশ ভঙ্গিমার ওপর। সেটা একটা ধরণ। ধরুন, 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি লিখলেন তখন তাঁরই এক কাছের মানুষকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন যে, মেয়েদের পক্ষ নিয়ে এভাবে কথা বলতে পারায় তিনি পরিতৃপ্ত। অন্যদিকে, প্রায় একই সময় বিপিনচন্দ্র পালের মতো রক্ষণশীল মানুষ অন্য একটি পত্রিকায় তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে, এই গল্প লেখার জন্য। সবাই জানেন, এরকম ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেকবার ঘটেছে। কিন্তু এসব ঘটনার মধ্যে একটা আগুয়ান শিল্প ও সমাজ ভাবনার সঙ্গে রক্ষণশীল মানসিকতার সংঘাতের চেহারাটা প্রকাশ্য হয়। সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা ভাল, সনাতনী ভাবনাকে সামনে এনে যারা সমাজের প্রগতি ভাবনার পথ আটকাতে চান, তাঁদের ভাবনা বহন করে যেসব সাময়িকপত্র, তারা আর যাই - হোক সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক বাহক হতে পারেন না। কিন্তু এর চেয়েও কদর্যতর দৃষ্টান্ত, স্বীকার করা ভাল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেকেরই অভিজ্ঞতার ভিতর! কী আশ্চর্য, তারাও নিজেদের লিটল ম্যাগাজিন বলেই দাবি করেন! এঁরা ভুলে যেতে চান, ব্যক্তিভাবনা বা গোষ্ঠীর ভাবনার আধার হলেও লিটল ম্যাগাজিন কোনও আত্মপ্রচারের মাধ্যম হতে পারে না। অথচ দিব্যি একফর্মা - দুফর্মার পত্রিকা বার করে, কিছু নিজের লেখা, কিছু বন্ধুবান্ধবের লেখা এলোমেলোভাবে ছাপিয়ে তারা বুক বাজিয়ে লিটল ম্যাগাজিন বলে বড়াই করে বেড়াচ্ছেন। ন্যূনতম কোনও পরিকল্পনার স্বাক্ষর নেই, যেটা করেছেন তা নিয়ে কোনও নিবিড় চর্চা নেই অথচ নিজেরা কিন্তু অসংগঠিত পুঁজি ও শ্রম তাতে বিনিয়োগ করছেন যা আয়তনের ক্ষুদ্রতা পেরিয়ে কোনও বৃহত্তর গুরুত্বের দিকে আদৌ নিয়ে যেতে পারছে না তাদের প্রয়াসকে।

মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, এরই পাশাপাশি রয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের সারিবদ্ধ প্রকাশের একধরনের অস্বস্তিকর পারস্পরিক পিঠ চুলকানোর প্রতিযোগিতা। ক - পত্রিকায় অমুক কবির কবিতার ফলাও স্তুতিবাক্য ছাপা হয় তো অন্য কোনও পত্রিকায় ক- পত্রিকার সম্পাদকের কাব্যপ্রতিভাবে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করা হয়। এঁর পুস্তকের সমালোচনা (পড়ুন, প্রশংসা - প্রতিবেদন) বেরোয় ওঁর কাগজে আর ওঁরটি বেরোয় এঁর কাগজে — এমন একটা দেওয়া - নেওয়ার রেওয়াজ আজ অনেকেই চিনে নিতে পারেন। আক্ষেপের কথা, বাংলা ভাষায় যাঁরা অন্তত ছোট পত্রপত্রিকাতেই কবি বা অন্যান্য সমালোচনা কর্মে নিজেদের যুক্ত রাখতে চান, তাঁদেরই কেউ কেউ এই দেওয়া - নেওয়ার গড়াপেটায় সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন — যা অনেকটা ক্রিকেট বেটিং চক্রে আম্পায়ারদের জড়িয়ে যাওয়ার মতোই দুর্ভাগ্যজনক।

পাশাপাশি বলা দরকার, আরেক রকম অভিসন্ধিময় প্রকাশনার কথা যেখানে লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোগী সম্পাদকরা নিজেদের প্রকাশনাটিকেই ব্যবহার করতে চান বড় প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্রর গোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের সেতু হিসেবে। অথচ সুযোগ পেলে তারাই আবাল লিটল ম্যাগাজিনের মহত্ত্ব বোঝানের চেষ্টায় বড় কাগজ বা পত্রপত্রিকাকে তেড়েফুঁড়ে গাল পাড়ে। এ যেন অনেকটা বামপন্থীদলগুলির মুক্ত অর্থনীতির প্রতিবাদ বাংলা বন্ধ ডাকা এবং একই সঙ্গে সেই নীতিরর অনুসরণে শিল্পোন্নয়নের শপথ নেওয়ারর মতো প্রকট দ্বিচারিতার কথা মনে করায়। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির সন্দীপ দত্ত, যখন তাঁর লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অধ্যাপক সুকুমার সেনের মত জানতে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন : কেন শুধু শুধু পয়সা খরচ করে জঞ্জাল রাশিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সেদিন এই প্রবীণ অধ্যাপকের বক্তব্যে অনেক মানুষ আহত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন কিন্তু আজ কখনও কখনও মনে হয়, ভুয়োদশী ভাষাবিদ সবটাই বোধহয় ভুল বলেননি।

এইসব প্রসঙ্গ পেরিয়েও থাকবে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা চিহ্ন। আগেও বলেছি, আবারও বলতে চাই, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ শেষ পর্যন্ত এক সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজের মধ্যে মূল্যবোধের রংবদল ঘটে আর তার ছায়া এসে পড়ে প্রতিটি সামাজিক প্রকোষ্ঠে। তাই আজ নানান দৃষ্টান্তে বিব্রত হতে হতে নিজের মধ্যেই প্রশ্ন জাগে, লিটল ম্যাগাজিন নামক সংগঠনের সঙ্গে যাঁরা নানাভাবে যুক্ত, তাঁরা সকলেই খুব মূল্যবোধ মান্য করেন তো? উচিত - অনুচিত নিয়ে যদি খুব বিতর্কও থাকে, অন্তত কিছু ন্যূনতম সৌজন্যবোধ বা রুচির প্রকাশ কি আমরা আশা করতে পারি না তাঁদের কাছ থেকে?

হয়তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বৃত্ত থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তের কিনারে উপনীত হওয়ার যৌক্তিকতার ঝুঁকি থাকে। তবু লিটল ম্যাগাজিনকে ঘিরেই যাঁরা লেখালেখি করেন তাঁদের অনেকেরই টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জড়ো করলে যে চিত্র প্রকাশ হয় আর যা-ই হোক তা গৌরবের নয়। আমার পরিচিত বৃত্তের অনেকে জানেন, বছর সাতেক আগে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা আমার একটি আমন্ত্রিত লেখাকে নিয়ে কী ধরণের অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে এখানে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই। কিন্তু বলার কথা এইটাই যে, তারপরেও এমন ঘটনা ঘটেছে প্রায়ই। জেলা শহরের তরুণ সম্পাদক বাড়ি এসে লেখা নিয়ে গেছেন, তারপর তিনি বেপাত্তা— ফোন করলে ফোন ধরেন না, চিঠি দিলে জবাব দেন না। কেউ আবার লেখা চেয়ে চিঠি পাঠালেন, স্বাভাবিক সৌজন্যে লেখাও পাঠানো গেল, কিন্তু হা হতোস্মি, সে লেখা ছাপাতে না পারার অক্ষমতা জানালেন পরের চিঠিতে— কারণ? নিছকই রাজনৈতিক চাপ। আমার মতো অকিঞ্চিৎকর কলমবাজের ছাইপাঁশ লেখা না ছাপালে বাংলা সাহিত্যের সম্পাদকের কিস্যু যায় আসে না, কিন্তু লেখা চেয়ে না-ছাপার অসৌজন্যে তাঁদের রুচি আর মানসিকতার যে অধঃপতনকে প্রকাশ করে, তাতে তাঁদের সম্মান বাড়ে কি? অবশ্য কেউ কেউ এমনও আছেন তাঁরা নিজের পছন্দের লেখাটি লিখিয়ে নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেন ঠিকসময়, পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠান টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়, সেখানে সম্পাদকের বাহান্ন সেকেন্ডর বাইট-ও থাকে। এরপর সেই সম্পাদক ঝলমলে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ভুলেই যান, তাঁর পত্রিকাটি যাঁদের লেখায় তিনি ভরিয়েছেন সেইসব হতভাগ লিখিয়েরা তাঁর থেকে একটি ন্যূনতম সৌজন্য সংখ্যা প্রত্যাশা করেন! কথায় কথা বাড়ে। তবু আরও একটি সাম্প্রতিক ঘটনা না জানিয়ে পারছি না। কয়েকমাস আগে একটি মফঃস্বল কবিতাপত্রের সম্পাদক একগুচ্ছ কবিতা পাঠানোর অনুরোধ করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যা নাকি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য একটি কবিতা - সংকলনে প্রকাশ করা হবে। মাত্রই কয়েকদিন আগে বাড়িতে একটি সুদৃশ্য কার্ড এসে পৌঁছেছে। সেখানে সম্পাদক জানাচ্ছেন, আগামী কোনো এক সন্ধ্যায়

রাজধানীর সাহিত্য সভাঘরে সংকলনটির শুভ উদ্বোধন ঘটবে। অনুষ্ঠানে আগ্রহী সকলের প্রবেশ অবাধ। কিন্তু সংকলনভুক্ত প্রতিটি কবিকে নগদ দুশো টাকা খরচ করে তাঁর কপিটি সংগ্রহ করতে হবে, সম্পাদক কাউকে সৌজন্য সংখ্যা দিতে প্রস্তুত নন, রাজি ও নন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সরাসরি বলা প্রয়োজন, লিটল ম্যাগাজিন শব্দবন্ধের সঙ্গে যে ভুলরকম আবেগ, স্বার্থপরতা আত্মপ্রচার ও ধান্দাবাজি আজকে জড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে তার মধ্যে নিজেকে মেলাতে আমি প্রস্তুত নই। আর গড়পড়তা লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে তেমন কোনও উচ্চাশার প্রাপ্তি আছে, এমনও মনে করার কোনও কারণ দেখছি না। পাশাপাশি ওটাও বলব, অনেকেই চমৎকার ভাবনাচিন্তা করে, নানান বিষয়ে পরিশ্রম করে, পরিকল্পনা করে কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন— এঁদের উদ্যোগ ও নিষ্ঠাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতে চাই। সামাজিক স্রোতের বা সাহিত্যিক ধারাবাহিকতার ধারক বা বাহক হিসেবে যদি লিটল ম্যাগাজিনকে চিহ্নিত হতে হয় তবে সেই উত্তরাধিকার এঁদেরই হাতে বলে আমার মনে হচ্ছে।

লিটল ম্যাগাজিন কথাটিকে সঙ্গে রাখি বা না-ই রাখি, আমার ধারণা এইসব ছোট ছোট সৎ উদ্যোগগুলিই একটা সমাজে বা সাহিত্যধারায় বিকল্প ভাবনার ভবিষ্যৎ। মনে রাখা দরকার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বিকল্প ভাবনার একটা পরিসর থাকা প্রয়োজন, তার একটা মঞ্চও থাকা জরুরী। এটা যে কোনও আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার জাগ্রত মননের প্রতীক, নতুবা একমুখী সমাজ যে জায়গায় পৌঁছায় তারই অন্য নাম ফ্যাসিজম। বলতে খারাপ শোনায়, তবু বলি, এই পোড়া বঙ্গে ইদানিং যে কোনও বিকল্প ভাবনায় জমি ক্রমশ একফসলি থেকে বন্ধ্যাত্বের দিকে চালিত। তবু এরই মধ্যে যেটুকু অন্য ভাবনায় চাষবাস তা এই ছোট পত্রিকাগুলিকে ঘিরেই। তাঁদের আমরা যে - নামেই ডাকি না কেন।

একটু প্রতিতুলনা না টেনে পারছি না। গত শতকের ষাট - সত্তরের দশকের পর থেকে ইউরোপ - আমেরিকার শিল্পোন্নত সমাজে প্রচলিত সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়গুলির বাইরে একেবারে নতুন কিছু বিষয়, মননশীল মানুষদের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল, যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সামাজিক ও সাহিত্যভাবনারও শরিক হয়ে যায়। লক্ষ্য করে দেখা যাবে, নানা ঘাত - প্রতিঘাতে আমাদের সমাজেও আস্তে আস্তে এমন কিছু বিষয় আজকে সামনে আসছে যা বিশ তিরিশ বছর আগেও আলোচনায় আসত না— যেমন ঃ পরিবেশবাদী ভাবনা, নারীদের অধিকারের নানা বিভঙ্গ, মানবাধিকার, অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গ ইত্যাদি। ভাবতে ভাল লাগছে, লিটল ম্যাগাজিন মানেই শুধু কবি আর কবিতার ক্লান্তিকর অক্ষরবিন্যাস, এই গতানুগতিক ধারণাটার বাইরে বাংলা ভাষায় আরও নানা বিষয় নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে খুব সার্থক মাত্রায়, যেখানে এইসব নতুন নতুন বিষয় জায়গা করে নিচ্ছে। সাহিত্যের অন্যান্য প্রান্ত (যেমন ঃ দলিত সাহিত্য), সংগীত, শিল্পভাবনা, কিশোর মনস্তত্ত্ব, পরিবেশ ভাবনা, লোকসংস্কৃতি এগুলি আজ পত্রপত্রিকার বিষয়ে পরিধিতে ঢুকে পড়েছে, যা একটি সংখ্যালঘু অথচ আগুয়ান মননশীলতার জানালা খুলে দিচ্ছে বলে ভরসা করা যায়।

আশার কথা, আজকে বাংলাভাষার প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে এইসব বিকল্প পত্রিকার ছোট উদ্যোগগুলি নিজদের সংবাদমাধ্যমে কিছু না কিছু জায়গা করে দিচ্ছেন যার মাধ্যমে আগ্রহী পাঠকরা হদিশ পাচ্ছেন এই প্রকাশনাগুলির। সংবাদপত্রের সঙ্গে এরকম আজগুবি ছায়াযুদ্ধের তত্ত্ব-খাড়া করার থেকে এই পারস্পরিক বিনিময়ের পথ চওড়া করলে কারোরই ক্ষতি নেই। এমন দৃষ্টান্তও দেওয়া যাবে যেখানে বড় সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধে এই ধরণের বিকল্প পত্রিকাগুলির কোনও বিশেষ সংখ্যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে পরিশ্রমী সম্পাদনার সত্যিই কোনও বিকল্প নেই। অথচ যাঁরা 'আমিও পারি' বলে লিটল ম্যাগাজিন করতে এগিয়ে আসেন তাঁরা এই কথাটা ভুলে যান একটি লিটল ম্যাগাজিনের সবথেকে বেশি প্রয়োজন একজন মেধাবী খোলা মনের সম্পাদক — সকলেই সম্পাদক হতে পারেন না, সকলের সেই চেষ্টা করা বিধেয় নয়। চলচ্চিত্রকে যদি ডিরেকটরস্ মিডিয়াম বলা যায়, তাতে লিটল ম্যাগাজিন নিশ্চয়ই এডিটরস্ মিডিয়াম।

এই প্রসঙ্গের নটে গাছ মুড়োনোর আগে শেষ একটি সম্ভাবনাকে উপস্থিত করতে চাই। তা হল আজকের ইন্টারনেট প্রযুক্তির কল্যাণে বাংলাভাষার পত্রপত্রিকাগুলি ছাপার অক্ষর ছাড়িয়ে সরাসরি ওয়েব পোর্টালে যুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীর বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বাংলাভাষায় প্রকাশিত ইন্টারনেট পত্রিকার সংখ্যাটা নেহাৎ কম নয় এবং অনেক ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত পত্রিকাও পাওয়া যাচ্ছে ইন্টারনেটে। বলছি না, মুদ্রিত অক্ষরের বিকল্প ইন্টারনেট বলতে চাইব, এটা মুদ্রিত মাধ্যমের সম্পূরক একটি মাধ্যম যা ক্রমশ বেশি বেশি মানুষের কাছ অনায়াসলভ্য হয়ে উঠছে। বিকল্প ভাবনার কারিগর সম্পাদক উদ্যোক্তারা এই মাধ্যমটাকে যোগ্যভাবে ব্যবহার করার কথা ভাবলে তাদের সামগ্রিক প্রয়াস সংহততর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আসলে এই সবটুকু মিলিয়েই বিকল্প ভাবনার ভবিষ্যৎ তাঁদের হাতে। বিকল্পহীনতার এই বন্ধ্যা সময়ে ভিন্ন ভাবনার সম্মেলক এই কণ্ঠগুলিই সোচ্চারে বলতে পারেন ঃ Yes, There is Alternative (TIA)

খাঁচার পাখি নয়, বনের পাখি নয়— আসুন, আজ আমরা এই (TIA) টিয়া পাখির গানশুনি।

এই গানেই রয়েছে সেই বাঁধনছেড়ার স্বপ্ন। ভোরের আলোর কানাকানি।